এপ্রিল - জুন ২০১৭
৬ষ্ঠ পর্ব, ২য় সংখ্যা

ISSN 2222-5188

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

সূচী

০৩ বিশেষ প্রবন্ধ — অস্টিওআর্থ্রাইটিস

০৬ জনস্বাস্থ্য — গর্ভাবস্থায় জন্ডিস

০৮ স্বাস্থ্যকথা — দইয়ের উপকারী সাত গুণ

০৯ সাধারণ জিজ্ঞাসা — কিছু সাধারণ প্রশ্ন এবং এর উত্তর

১০ চিকিৎসা — মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ও তার প্রতিকার; জন্মের সময় শিশুর কম ওজন ও তার পরিচর্যা

১৪ চমকপ্রদ তথ্য — গবেষণাগারে তৈরি কৃত্রিম ত্বক; তৈলাক্ত মাছে বাতের ঝুঁকি কমে

১৫ ইনফো কুইজ — ১০ টি কুইজ

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক
ডাঃ ফাহিমা জাহান ইশানা
ডাঃ নুরুল আনোয়ার সেতু
ডাঃ রাশনা শারমিন যুথী

সম্পাদকীয়

প্রিয় চিকিৎসক,

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর একটি হলো চিকিৎসা। যেকোনো রোগের বিপরীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি সুবিশাল পরিসর যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও আধুনিক হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতার সাথে মিল রেখে আমরা প্রতিবারের মতো এবারো নতুন নতুন তথ্য দিয়ে ইনফো মেডিকাস এর এই সংখ্যাটি সাজিয়েছি।

বর্তমান সময়ের খুবই পরিচিত ও প্রচলিত একটি রোগ হলো অস্টিওআর্থ্রাইটিস। প্রধানত বয়স্করা এ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সব বয়সীদের মধ্যে এটি হতে পারে। তাই এবারের বিশেষ প্রবন্ধে অস্টিওআর্থ্রাইটিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এবারের চমকপ্রদ তথ্য বিভাগে দুইটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে যা পড়ে সবাই খুব চমৎকৃত হবেন। গবেষণাগারে তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম ত্বক এবং তৈলাক্ত মাছ নিয়মিত খেলে বাতের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায় এমন কিছু বিষয় জানতে পারবেন এই বিভাগে।

গর্ভকালীন সময় একজন মা নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তার মধ্যে গর্ভাবস্থায় জন্ডিস অন্যতম। এই রোগে যথা সময়ে সঠিক চিকিৎসা না করালে গর্ভবতী মা ও শিশুর অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবারের জনস্বাস্থ্য বিভাগে আমরা গর্ভাবস্থায় জন্ডিস নিয়ে আলোচনা করেছি।

চিকিৎসা বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার একটি হচ্ছে মূত্রনালীর সংক্রমণ ও তার প্রতিকার এবং আরেকটি হচ্ছে জন্মের সময় শিশুর কম ওজন। মূত্রনালীর সংক্রমণ যেকোনো বয়সী মানুষের জন্য অনেক গুরুতর সমস্যা, যার প্রতিকার জানা খুবই জরুরী। অন্য দিকে জন্মের সময় শিশুর কম ওজন হলে শিশুর জীবনের ঝুঁকি থাকে। তাই জন্মের সময় শিশুর কম ওজন ও এর প্রতিকার নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দই রাখলে স্বাস্থ্যগত অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই স্বাস্থ্যকথা বিভাগটিতে আমরা উপস্থাপন করেছি দইয়ের উপকারী কিছু গুণ।

আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করবে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট

অস্টিওআর্থ্রাইটিস

অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলো অস্থিসন্ধি বা গিটের প্রদাহ যা আমাদের দেশে গিটে বাত নামে পরিচিত। সাধারণত ৫০ থেকে ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের মানুষেরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে এবং পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিক মতো করতে পারে না এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্টে দিন অতিবাহিত করে। বিশ্বব্যাপী পঞ্চাশোর্ধ মানুষের ব্যথা ও অক্ষমতার মূল কারণ হলো অস্টিওআর্থ্রাইটিস।

গিটের গঠন

আমাদের শরীরের কাঠামো তৈরী হয় হাড় দিয়ে, যার উপর ভর দিয়ে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে ও কাজ করতে পারি। একটি হাড় আরেকটি হাড়ের সাথে গিটের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। গিট ও হাড় ঘিরে থাকে মাংশপেশী যার কাজ হলো অস্থিসন্ধি বা গিটকে নড়াচড়া করানো এবং ভাজ করানো। দুইটি হাড় যেখানে এসে সংযুক্ত হয়েছে সেখানে হাড়ের দুই প্রান্ত তরুণাস্থি দিয়ে আবৃত থাকে এবং হাড় দুটো যুক্ত থাকে জয়েন্ট ক্যাপসুল দিয়ে। ক্যাপসুলের ভিতরের দিকের যে আবরণী থাকে তাকে "সাইনোভিয়াম" বলে। সাইনোভিয়াম থেকে "সাইনোভিয়াল ফ্লুইড" তৈরি হয়, যা জয়েন্ট ক্যাপসুলের মধ্যে জমা থাকে। সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এক ধরণের পিচ্ছিল পদার্থ যা তরুণাস্থির সাথে মিলে অস্থিসন্ধিকে ঘর্ষণবিহীন ও মসৃনভাবে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার প্রক্রিয়া

শরীরের বিভিন্ন গিটে ও হাড়ের শেষ প্রান্তে তরুণাস্থি থাকে যা কুশনের মতো কাজ করে। কোন কারণে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের পরিমাণ যদি কমে যায়, তখন ক্রমাগত চলাফেরার ফলে গিটের হাড়ের মধ্যে ঘর্ষণ হয়। এই ঘর্ষণের কারণে হাড় ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। যার ফলে গিটে ব্যথা হয়, গিটে অস্টিওফাইট নামের নতুন হাড় তৈরি হয়, গিটের সক্রিয়তা কমে যায় ও পরে অষ্টিওআর্থ্রাইটিস হয়। অস্টিওআর্থ্রাইটিস এক বা একাধিক গিটে হতে পারে যেমন- হাত ও পায়ের আঙুলের গিট, মেরুদণ্ডের গিট এবং হাঁটু ও কোমরের গিট। তবে ওজন বহনকারী বড় গিটে এটি বেশি হয়ে থাকে।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস যেসব অস্থিসন্ধিতে হয়

- আঙ্গুলের অস্থিসন্ধিঃ আঙ্গুলের ইন্টারফেরেঞ্জিয়াল জয়েন্ট বা গিটে হয়। এটি মধ্যবয়সী মহিলাদের বেশি হয়
- হাঁটুর অস্থিসন্ধিঃ হাঁটুর জয়েন্টে বা গিটে হয় যার ফলে বেশিক্ষণ হাঁটা, চেয়ার থেকে উঠা এবং জুতা ও মোজা পড়া কঠিন হয়ে পড়ে
- কোমড়ের অস্থিসন্ধিঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোমড়ের জয়েন্টের উপরিভাগ আক্রান্ত হয় যা মহিলাদের বেশি হয়। এর ফলে উরুতে বেশি ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়াও নিতম্ব ও হাঁটুতে ব্যথা অনুভূত হতে পারে

- মেরুদন্ডের অস্থিসন্ধিঃ সারভাইকাল ও লাম্বার স্পাইনে বেশি হয় যার ফলে সারভাইকাল ও লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস হতে পারে। প্রথমে ব্যথা পিঠের নিচের দিকে হয় এবং তা পরবর্তীতে হাতে, উরুতে এবং পায়ে ছড়িয়ে পড়ে। চলাফেরা করলে ব্যথা বেড়ে যায় কিন্তু বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে যায়

যাদের ঝুঁকি বেশী

- বয়সঃ ৪০ বা ৫০ বছর বয়সের পর থেকে এই রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ৫০ থেকে ৫৫ বছর ও তার উর্ধ্বে এক-তৃতীয়াংশ এবং ৭০ বছরের উর্ধ্বে ৭০% মানুষ অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভূগেন
- বংশগতঃ সাধারণত বংশে কারো অস্টিওআর্থ্রাইটিস থাকলে এ রোগ হতে পারে
- লিঙ্গঃ আনুপাতিক হারে মহিলারা এ রোগে বেশী ভোগেন তবে পুরুষ বা মহিলা যেকারো এ রোগ হতে পারে। ৫০ বছরের পূর্বে মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা এবং ৫০ বছরের পরে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অস্টিওআর্থ্রাইটিসে বেশি ভূগে থাকেন
- শরীরের ওজনঃ মোটা বা ওজন বেশি হলে গিটের উপর বেশি চাপ পড়ে এবং তরুণাস্থি দ্রুত ক্ষয় হয় যার ফলে এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়
- গিটে আঘাতঃ যেকোনো কারণে গিটে আঘাত পেলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়
- অতিরিক্ত চলাফেরাঃ যারা অতিরিক্ত চলাফেরা করেন তাদের অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে
- পেশাঃ কোনো কোনো পেশাতে গিটের উপর বেশী চাপ পড়ে এবং তরুণাস্থির ক্ষয় বেড়ে গিয়ে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে। যেমন- কৃষক ও রিক্সাচালকদের কোমরে অস্টিওআর্থ্রাইটিস বেশি হয়ে থাকে
- মাংসপেশীর দুর্বলতাঃ সবল মাংসপেশী গিটের চারপাশে অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। মাংশপেশী দুর্বল হলে গিট সহজেই আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষয় বেড়ে যায়
- খেলাধুলাঃ খেলাধুলার সময় বারবার আঘাত পেলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়
- বিভিন্ন রোগঃ যেমন- ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরোডিজম ও হাইপারথাইরোডিজম, অ্যাক্রোমেগালী, পেজেটস ও উইলসন ডিজিজ হলে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়
- জন্মগত বা অস্বাভাবিক হাড়ের বৃদ্ধিঃ জন্মগত বা অস্বাভাবিক হাড়ের বৃদ্ধির ফলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে

কারণ

প্রাইমারি বা প্রাথমিক কারণ

নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়া অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে তা প্রাথমিক কারণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে

সেকেন্ডারি বা গৌণ কারণ

- পূর্বের কোন রোগের কারণে অস্থিসন্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেমন-
  - রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস
  - গাউট
  - সেরো-নেগেটিভ স্পন্ডআর্থ্রাইটিস
  - সেপ্টিক আর্থ্রাটিস
  - পেজেটস ডিজিজ
  - অ্যাভাস্কুলার নেক্রোসিস
- মেটাবলিক ডিজিজ যেমন-
  - কন্ড্রক্যালসিনোসিস
  - বংশগত হিমোক্রমাটোসিস
  - অ্যাক্রোমেগালী
- সিস্টেমিক ডিজিজ যেমন-
  - হিমোফিলিয়া- রিকারেন্ট হিমার্থ্রাইটিস
  - হিমোগ্লোবিনোপ্যাথী- সিকেল সেল ডিজিজ
  - স্নায়ু রোগ
- মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর যেমন-
  - লিগামেন্টে আঘাত বা মারাত্বকভাবে ছিড়ে যাওয়া
  - অতিরিক্ত চলাফেরা

লক্ষণ

অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে নিচের লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়-

- অস্থিসন্ধিতে ব্যথা অনুভূত হয়
- চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়
- রোগ গুরুতর হলে, রাতে এবং বিশ্রামের সময় ব্যথা হয়
- পেশী শুকিয়ে যায় এবং অস্থিসন্ধির শক্তি কমে যায়
- যে অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হয় তা স্বাভাবিকের চেয়ে ফুলে যায়
- আক্রান্ত অস্থিসন্ধি নড়াচড়ার সময় শব্দ হয় (ক্রিপিটাস)

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

- রক্তের পরীক্ষা
  - ই এস আর (ESR)
  - সি আর পি (CRP)
  - রিউওমাটোয়েড ফ্যাক্টর
  - অ্যান্টিনিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি
- এক্স-রে (X-ray)ঃ এই পরীক্ষাটি রোগ নির্ণয়ের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ। এই পরীক্ষার মাধ্যমে অস্থিসন্ধির মধ্যবর্তী জায়গা (কমে যায়) ও হাড়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন (নতুন হাড়) আছে কিনা তা দেখা হয়
- এম আর আই (MRI)ঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে তরুণাস্থিতে পরিবর্তন দেখা যায়। পরীক্ষাটি প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সব সময়ই রোগ নির্ণয়ে সহায়ক
- আর্থ্রোপ্যাথীঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে তরুনাস্থির ক্ষয় দেখা হয়
- সাইনুভিয়াল ফ্লুইড পরীক্ষাঃ অনেক সময় গিট থেকে সাইনুভিয়াল ফ্লুইড বের করে তা পরীক্ষা করা হয়। এটি গিটের ইনফেকশন ও বাত (Gout) রোগ নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে

চিকিৎসা

চিকিৎসার শুরুতেই অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা গিটে বাত এর কারণ এবং রোগের তীব্রতা নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। এ রোগ একবার শুরু হলে এটি বাড়তে থাকে। তবে দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও সুষ্ঠু কিছু নিয়মের মাধ্যমে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের তীব্রতা এবং উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- রোগীকে অতিরিক্ত ওজন কমাতে বলতে হবে
- রোগীকে ফল, শাকসবজি ও চর্বিবিহীন মাংস খেতে বলতে হবে
- রোগীকে হাঁটু ও কোমড় ভাঁজ করা থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে
- রোগীকে ভারি কাজ না করার জন্য বলতে হবে
- গিটের সাপোর্ট- রোগীকে ওয়াকিং স্টিক, উঁচু চেয়ার, হাঁটু সাপোর্ট ও কুশনযুক্ত জুতা ব্যবহার করতে বলতে হবে

ওষুধ

- ব্যথার জন্য প্যারাসিট্যামল, ডাইক্লোফেনাক ও ন্যাপ্রোক্সেন ইত্যাদি ওষুধ দেয়া যেতে পারে
- তরুণাস্থির ক্ষয় রোধ করার জন্য গ্লুকোস্যামাইন, কন্ড্রোইটিন, ডায়াসেরিন ইত্যাদি ঔষধ দেয়া যেতে পারে
- ভিটামিন সি, ই ও ডি এবং ক্যালসিয়াম নিয়মিত সেবন করলে এ রোগের তীব্রতা কমে আসে
- স্টেরয়েড ও হায়ালুরোনিক এসিড জয়েন্টে ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্যবহার করলে রোগের উপসর্গ সাময়িক উপশম হয়

সার্জিকেল চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ওষুধের দ্বারা চিকিৎসায় ভালো না হলে সার্জিকেল চিকিৎসা করা হয়। কিছু সার্জিকেল চিকিৎসা পদ্ধতির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো-

- আর্থ্রোস্কোপিঃ এই পদ্ধতিতে ছোট ছিদ্রের সাহায্যে আর্থ্রোস্কোপ অস্থিসন্ধির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে অতিরিক্ত হাড়, সাইনোভিয়াম, বিচ্ছিন্ন হাড় ও তরুণাস্থি বের করা হয় এবং হাড়ে মাইক্রো পাংচার করা হয়
- অস্টিওটোমিঃ এই পদ্ধতিতে হাড় কেটে অস্থিসন্ধির আকৃতি ঠিক করা হয়
- কার্টিলেজ গ্রাফটিংঃ এই পদ্ধতিতে রোগীর শরীরের অন্য অংশ থেকে টিস্যু নিয়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি প্রতিস্থাপন করা হয়
- টোটাল নী রিপ্লেসমেন্টঃ এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হাঁটুকে নতুন করে রিপ্লেসমেন্ট বা পুনঃস্থাপন করা হয়

ফিজিওথেরাপি

প্রাথমিক চিকিৎসা, ওষুধ এবং সার্জিকেল চিকিৎসার পাশাপাশি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমেও এ রোগের চিকিৎসা করা হয়

উপদেশ

- রোগীকে গিটের যত্ন নিতে বলতে হবে
- রোগীকে চেয়ারে বসতে বলতে হবে
- রোগীকে উঁচু কমোড ব্যবহার করতে বলতে হবে
- রোগীকে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে বলতে হবে
- রোগীকে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরপর অবস্থান পরিবর্তন করতে বলতে হবে
- রোগীকে হাঁটুর ব্যায়াম করতে বলতে হবে
- যে সমস্ত কাজে গিটের উপর চাপ পড়ে সে কাজগুলো রোগীকে পরিহার করতে বলতে হবে

তথ্যসূত্রঃ
১. *Davidson`s Principle and Practice of Medicine, 22nd edition*
২. *Kumar and Clark's, Clinical Medicine, 7th edition*
৩. *ইন্টারনেট*

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস

জন্ডিস হলো লিভারের প্রদাহের লক্ষণ। আমাদের দেশে গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গর্ভাবস্থায় মায়ের জন্ডিস হলে পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে জন্ডিস বিস্তার লাভ করে। গর্ভাবস্থায় প্রথম থেকে চিকিৎসা না করালে পরবর্তীতে গর্ভবতী মা ও বাচ্চার বিভিন্ন জটিলতা হতে পারে। তবে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব।

কারণ

যেসব কারণে গর্ভবতী মা জন্ডিসে আক্রান্ত হয় সেগুলা নিচে দেয়া হলো-

- ভাইরাসের কারণে
  - হেপাটাইটিস এ ভাইরাস
  - হেপাটাইটিস বি ভাইরাস
  - হেপাটাইটিস সি ভাইরাস
  - হেপাটাইটিস ই ভাইরাস
- পিত্তথলি ও পিত্তনালীর পাথর
- গর্ভাবস্থায় টক্সিমিয়া অর্থাৎ শরীরে বিষাক্ত পদার্থ জমলে
- গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বমি হলে
- লিভারের ক্ষতি করে এমন ওষুধ গর্ভাবতী মা খেলে
- গর্ভাবস্থায় রক্তের কোনো অসুখ হলে যেমন- থ্যালাসেমিয়া। এতে রক্ত কণিকা সহজে ভেঙে যায় এবং বিলিরুবিন রক্তে জমে জন্ডিস দেখা দিতে পারে
- কোনো কারণে মাকে যদি ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা রক্ত সরবরাহ করলে
- গর্ভাবস্থায় শেষ দিকে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে জন্ডিস হতে পারে যেমন-
  - প্রি-একল্যামসিয়া ও একল্যামসিয়া
  - এ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার
  - হেল্প সিন্ড্রোম (HELLP Syndrome) এর কারণে

লক্ষণ

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস হলে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়-

- চোখের রঙ হলুদ হয়
- প্রস্রাবের রঙ হলুদ হয়
- খাবারে অরুচি হবে
- বমি বমি ভাব বা বমি হয়
- মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে

পরীক্ষা

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস শনাক্ত করার জন্য নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয়-

- রক্তের বিলিরুবিন
- এ এল টি (ALT)
- এ এস টি (AST)
- ভাইরাল মার্কার
- প্রথম্বিন টাইম

চিকিৎসা

গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। সাধারণত কিছু নিয়ম মেনে চললে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলতে হবে
- রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও ফলের জুস খেতে বলতে হবে
- রোগীকে শর্করা ও আমিষ জাতীয় খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে বলতে হবে
- রোগীকে গ্লুকোজ খেতে বলতে হবে, যদি রোগী মুখে গ্লুকোজ খেতে না পারে তাহলে ১০% তরল গ্লুকোজ শিরা পথে দিতে হবে

ওষুধ

- ট্যাবলেট নিওমাইসিনঃ অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ যাতে তৈরি না হয় সে জন্য ট্যাবলেট নিওমাইসিন দিতে হবে
- ভিটামিন কে (Vitamin K)ঃ প্রোথ্রম্বিনের লেভেল বাড়ানোর জন্য ভিটামিন কে (Vitamin K) দিতে হবে। প্রতিষেধক হিসেবে অক্সিটোসিন দিতে হবে
- ল্যামিভিউডিনঃ গর্ভাবস্থায় ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ধরা পড়লে ল্যামিভিউডিন নামক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে
- নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে হাইপোকেলেমিয়া, হাইপো-গ্লাইসেমিয়া ও হাইপোকেলসেমিয়া সংশোধন করতে হবে। যদি রক্তজনিত জটিলতা দেখা যায় তাহলে রক্ত ও ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দিয়ে সংশোধন করতে হবে
- কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা দিতে হবে
- জন্মের পর পরই নবজাতক শিশুকে Active ও Passive টিকা দিতে বলতে হবে

জটিলতা

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস হলে মা ও শিশুর বিভিন্ন রকম জটিলতা হতে পারে।

মায়ের জটিলতা

গর্ভাবস্থায় লিভারের কাজ অনেক বেড়ে যায়। গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের প্রকোপ বেড়ে গেলে রক্তে বিলিরুবিন জমে যায়। ফলে লিভারের কোষের বিশেষ ক্ষতি হয়। আর এটা থেকে মায়ের মানসিক চেতনা প্রায় লুপ্ত হতে পারে এবং কোমায় চলে যেতে পারে, এমনকি প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে। এছাড়া গর্ভাবস্থায় জন্ডিসে লিভারের কোষে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান প্রোথ্রম্বিন সৃষ্টি ব্যাহত হয়। এতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না এবং শিশুর জন্ম দেবার পরে প্রসূতি মায়ের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় যা মায়ের প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় শেষ দিকে জন্ডিস হলে এবং বিশেষ করে 'ই' ভাইরাস দিয়ে জন্ডিস হলে এ্যাকিউট লিভার ফেইলরের সম্ভাবনা থাকে।

বাচ্চার জটিলতা

গর্ভাবস্থায় শেষ দিকে মায়ের জন্ডিস হলে গর্ভপাত হতে পারে ও বাচ্চা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জন্ম হতে পারে। তবে জন্ডিস যদি গর্ভকালীন প্রথম ও মধ্য ভাগে হয় তখন বাড়তি ঝুঁকি নেই। তাছাড়া গর্ভাবস্থায় মায়ের জন্ডিস হলে পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে জন্ডিস বিস্তার লাভ করতে পারে।

উপদেশ

জন্ডিস থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিচের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

- হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি' এর জন্য টিকা নিতে বলতে হবে
- ফুটানো, বিশুদ্ধ পানি পান করতে বলতে হবে
- বাইরের খোলা খাবার বর্জন করতে বলতে হবে
- খাবার ঢেকে রাখতে বলতে হবে এবং পচা-বাসি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে
- রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়ার সময় পুরোনো বা ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও সুচ ব্যবহার করা যাবে না
- হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত মায়ের সন্তানের জন্মের পরপরই তাকে হেপাটাইটিস বি-এর টিকা দিতে বলতে হবে
- রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ দুই বা তিন দিন পরপর যাচাই করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলতে হবে

তথ্যসূত্রঃ

১। DC Dutta's textbook of obstetrics, 8th edition

২। ইন্টারনেট

দইয়ের উপকারী সাত গুণ

দই পছন্দ করেন না এমন মানুষ খুব কমই আছে। বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে, জন্মদিন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে খাবার পর্ব শেষে একটুখানি দই আমরা সবাই খাই। পুষ্টিবিদদের মতে মুখরোচক এই দই স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দই রাখলে স্বাস্থ্যগত অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে

আধুনিক যুগে বেশিরভাগ মানুষই হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভূগে থাকেন। অল্প বয়সী মানুষেরাও এখন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। নিয়মিত দই খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে এবং উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যার ফলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে।

দাঁত ও হাড় মজবুত করে

দইয়ে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন-ডি যা হাড় এবং দাঁত মজবুত করে। এছাড়াও এতে রয়েছে ফসফরাস যা দাঁতের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটা উপাদান। নিয়মিত দই খেলে হাড়ের রোগ অস্টিওপরোসিস থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হজমশক্তি বৃদ্ধি করে

দই হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। দইয়ের মধ্যে কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া আছে যা খাবার হজম করতে সাহায্য করে থাকে। শুধু তাই নয় এটি অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করে।

ওজন কমায়

দই কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে ফলে দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ওজন কমায়। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ওবেসিটির ২০০৫ এর একটি গবেষণায় বলা হয়, দই শরীরের মেদ ঝরাতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

দইয়ে থাকা ব্যাকটেরিয়া দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এতে থাকা প্রোবায়োটিক উপাদান যা শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে এবং উপকারি ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

মানসিক চাপ কমায়

দই মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমাতে সাহায্য করে। আমেরিকায় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, টক দই আবেগ নিয়ন্ত্রন করে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমাতে সাহায্য করে।

ত্বকের যত্ন

ত্বক পরিচর্যায় দই অনেক আগে থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

সাধারণ জিজ্ঞাসা

১

প্রশ্নঃ শরীরে তিল থেকে কি ক্যানসার হতে পারে?

উত্তর
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শরীরে তিল থেকে তেমন কোনো রোগ হয় না। তবে তিল থেকে কখনো কখনো ক্যানসার হতেও পারে। এক্ষেত্রে তিলের আকার-আকৃতি এবং রং এর যদি কোনো পরিবর্তন হয় তবে সতর্ক হতে হবে। এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত বায়োপসি করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

২

প্রশ্নঃ জ্বর হলে একজন মানুষ দিনে কয়টা প্যারাসিটামল খেতে পারবেন?

উত্তর
জ্বর হলে বা অন্য কোনো কারণে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে প্যারাসিটামল (৫০০ মিলিগ্রাম) আটটির বেশি খাওয়া উচিত নয়। এর বেশি খেলে লিভারের ক্ষতি হতে পারে। ২০ টির বেশি প্যারাসিটামল একদিনে খেলে লিভার অকেজো হয়ে যেতে পারে। তাই যাদের লিভারে সমস্যা রয়েছে, তাদের অল্পমাত্রায় প্যারাসিটামল খাওয়া উচিত।

৩

প্রশ্নঃ কিডনির সমস্যায় ফলমূল খেতে নিষেধ করা হয় কেন?

উত্তর
সব কিডনির সমস্যায় ফলমূল খেতে নিষেধ করা হয় না। যেসব রোগীদের রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা একটু বেশি সেসব রোগীকে উচ্চ পটাশিয়ামযুক্ত ফলমূল ও সবজি খেতে নিষেধ করা হয় যেমন- কলা, টমেটো, ডাব, আলু এবং পালং শাক ইত্যাদি। তবে রোগীরা কম পটাশিয়াম আছে এমন ফল খেতে পারবেন যেমন- পেঁপে, আনারস, শশা, পেয়ারা, আঙুর এবং আপেল ইত্যাদি।

৪

প্রশ্নঃ তামাক ও জর্দা ক্ষতিকর, কিন্তু সুপারি ক্ষতিকর নয় এ ধারণা কি ঠিক?

উত্তর
অনেকেই মনে করেন, তামাক, জর্দা ক্ষতিকর হলেও সুপারি ক্ষতিকর নয়। এমন ধারণা একদম ভুল। বরং সুপারিকে রাখা হয়েছে ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ বা কারসিনোজেন এর তালিকায়। মুখ গহ্বরের ক্যানসারের অন্যতম কারণ হিসেবে সুপারি খাওয়ার অভ্যাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া পানের সঙ্গে ব্যবহৃত চুন দাঁত ও মাড়ির নানা রোগ সৃষ্টি করে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ও তার প্রতিকার

শরীরে মূত্র তৈরি এবং দেহ থেকে তা নিঃসরণের জন্য যে অঙ্গসমূহ কাজ করে সেই অঙ্গসমূহকে একত্রে মূত্রতন্ত্র বলে। মূত্রতন্ত্রের যেকোনো স্থানে কোনো কারণে সংক্রমণ দেখা দিলে তাকে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (UTI) বলে। এই রোগ মহিলাদের মাঝে বেশি দেখা যায়। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ২০ বছর বয়সীদের মধ্যে ৩% এবং প্রতি ১০ বছর বয়সীদের মাঝে ১% হারে সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের মাঝে এই রোগের প্রবণতা কম। মূত্রনালী সংক্রমণের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিডনির কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রকারভেদ

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১. মূত্রতন্ত্রের নিম্নাংশের সংক্রমণ

যখন মূত্রতন্ত্রের নিম্নাংশ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় তখন তাকে মূত্রতন্ত্রের নিম্নাংশের সংক্রমণ বলে। যেমন- সিস্টাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস

২. মূত্রতন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশের সংক্রমণ

যখন মূত্রতন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় তখন তাকে মূত্রতন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশের সংক্রমণ বলে। যেমন- পায়েলোনেফ্রাইটিস

কারণ

নানা রকম জীবাণু এই সংক্রমণের জন্য দায়ী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া (৯৫%) এবং কিছু ক্ষেত্রে ফাঙ্গাস দ্বারা এই রোগ হয়। সাধারণত যেসব জীবাণু দিয়ে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ হয় তা নিচে দেয়া হলো-

- *E. Coli*- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী (৮০%)
- Pseudomonous
- Proteus
- *Streptococci* (ব্যাকটেরিয়া বেশীর ভাগ সময় হাসপাতালে সংক্রমণের জন্য দায়ী)
- *Staphylococcus epidermedis*
- Klebsiella

জীবাণু ছাড়া নিচের কারণ সমূহে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ হয়ে থাকে। যেমন-

- পানি কম পান করলে
- মূত্রনালীতে ক্যাথেটার ব্যবহার করলে
- ডায়াবেটিসজনিত রোগ থাকলে
- প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হলে
- বয়স ষাটের বেশি হলে
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হলে
- এলার্জি জনিত কারণে

যাদের ঝুঁকি বেশি

- মূত্রনালীর সংক্রমণ মেয়েদের বেশী হয়, কারণ মেয়েদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য (১.৫ ইঞ্চি) ছেলেদের মূত্রনালির দৈর্ঘ্যর তুলনায় ছোট হয়
- মেয়েদের মূত্রদ্বার ও যোনিপথ খুব কাছাকাছি থাকে। তাই ঋতুস্রাবের সময় পরিচ্ছন্নতা মেনে না চললে জীবাণু প্রথমে যোনিপথে ও পরে সংলগ্ন মূত্রনালীকে সংক্রমিত করে

লক্ষণ

- জ্বর হওয়া
- বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া
- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
- ঘন ফেনার মত অথবা দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হওয়া
- প্রস্রাবের প্রচণ্ড চাপ অনুভূত হওয়া
- প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা অনুভূতি হওয়া
- প্রস্রাব করার পর আবার প্রস্রাব হবে এমন ভাবের উদ্রেক হওয়া
- তল পেটে স্বাভাবিকভাবে চাপ দিলে ব্যথা অনুভব করা
- কোমরের পাশের দিকে অথবা পিছনে মাঝামাঝি অংশে ব্যথা হওয়া

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

মূত্রতন্ত্রে জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে কিনা, কিংবা সংক্রমণের পরবর্তী জটিলতা নির্ণয়ের জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করার প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য পরীক্ষাগুলো হল-

- প্রসাবের রুটিন পরীক্ষা (Urine for R/E)
- প্রসাবের কালচার ও সেনসিটিভিটি টেস্ট (Urine for culture & Sensitivity)
- প্লাজমা ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন
- ব্লাড কালচার
- পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফি
- এক্স-রে (X-ray)
- ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাফি (IVU)
- মিকচুরেটিং সিসটো ইউরেথ্রোগ্রাফি (MCU)
- সিসটোস্কপি (Cystoscopy)- যদি প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণের ইতিহাস থাকে

চিকিৎসা

- ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে সংক্রমণ হলে নিম্নলিখিত গ্রুপের এন্টিবায়োটিক ওষুধ সমূহ দেয়া হয়ে থাকে-
  - সেফালোস্পরিন
  - সিপ্রোফ্লক্সাসিন
  - লিভোফ্লক্সাসিন
  - গ্যাটিফ্লক্সাসিন
- যাদের জটিলতম (কমপ্লিকেটেড) মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ হয়, তাদের সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ভাল হতে ১ থেকে ২ সপ্তাহ সময় লাগে। তখন প্রয়োজনে শিরা পথে এন্টিবায়োটিক ওষুধ দেয়া হয়
- ছত্রাকজনিত কারণে সংক্রমণ হলে এন্টিফাংগাল গ্রুপের ওষুধ দেয়া হয়
- মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণের সাথে চুলকানি থাকলে তা রোধ করার জন্য এন্টিহিসটামিন জাতীয় ওষুধ সেবন এবং এন্টি ফাংগাল বা কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় ক্রিম ব্যবহার করা হয়
- ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অসুখ যেগুলোতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় সেগুলো সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে হবে

প্রতিরোধ

যে কোন রোগে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রোগীকে নিম্নলিখিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলতে হবে-

- পানি ও অন্যান্য তরলজাতীয় খাবার যেমন- ফ্রুট জুস, ডাবের পানি ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণ ও বৃদ্ধি প্রতিহত করে মূত্রতন্ত্রকে পরিষ্কার রাখে। তাই প্রচুর পরিমাণে পানি ও অন্যান্য তরলজাতীয় খাবার খেতে বলতে হবে
- মলত্যাগের পর মলদ্বার ভালভাবে সাবান দিয়ে পরিস্কার করতে বলতে হবে
- যৌন সহবাসের আগে ও পরে অবশ্যই যৌনাঙ্গ পরিস্কার করতে বলতে হবে
- চিকিৎসায় মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ভাল হলেও, পুনরায় আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রতিরোধের উপায়গুলো নিয়মিত অভ্যাস করতে বলতে হবে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

জন্মের সময় শিশুর কম ওজন ও তার পরিচর্যা

জন্মের সময় সঠিক ওজন একটি নবজাতকের সুস্থতার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু সবারই কাম্য। জন্মের সময় একটি সুস্থ নবজাতকের ওজন প্রায় ২.৫ কেজি বা সাত পাউন্ড হওয়া উচিত। যদি এর কম হয় তাহলে সেই নবজাতকটি জন্মের পর নানা ধরণের অসুস্থতায় ভোগে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস) ২০১২-১৩ এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ২৬ শতাংশ নবজাতক কম ওজন নিয়ে জন্ম হয়। এর প্রভাবে শিশুর পুষ্টিহীনতা, প্রতিবন্ধীতা, বুদ্ধির স্বল্পতা, কম উৎপাদনশীলতা, শারীরিক গঠনে যেমন সমস্যা বাড়ে তেমনি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায় এবং সেই সাথে শিশুর মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

কম ওজনের শিশু

- জন্মের সময় শিশুর ওজন যদি ২.৫ কেজি বা সাত পাউন্ডের কম হয়, তাহলে নবজাতক শিশুটিকে কম ওজনের শিশু বা Low Birth Weight Baby (LBW) বলে
- জন্মের সময় শিশুর ওজন ১.৫ কেজির কম হয়, তাহলে সেই নবজাতককে খুব কম ওজনের শিশু বা Very Low Birth Weight Baby (VLBW) বলে
- জন্মের সময় শিশুর ওজন যদি ৭৫০ গ্রামের কম হয়, তাকে অত্যন্ত ওজনহীন শিশু বা Extreme Low Birth Weight Baby (ELBW) বলা হয়। সাধারণত স্বাভাবিক সময়ের আগে (গর্ভধারণের ৩৭ সপ্তাহের আগে জন্ম হলে) জন্মনো শিশুর ওজন কম হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়া শিশুর ওজনও কম হতে পারে

শিশুর ওজন কম হওয়ার কারণ

মাতৃজনিত কারণ

- অল্প বয়সে (২০ বছরের নীচে) সন্তান ধারণ করলে
- মা অপুষ্টিতে ভুগলে
- একাধিক গর্ভধারণ করলে
- বিভিন্ন রোগ যেমন- রক্তসল্পতা, ডায়াবেটিসজনিত রোগ, জরায়ুতে জীবাণু সংক্রমণ, উচ্চ রক্তচাপ, টক্সিমিয়া, ম্যালেরিয়া, কিডনির সমস্যা ইত্যাদি রোগ হলে
- জরায়ুতে অস্বাভাবিকতা থাকলে

শিশুজনিত কারণ

- জন্মগত সংক্রমণ- রুবেলা, টক্সপ্লাস্‌মা, হারপিস ইত্যাদি দ্বারা সংক্রমিত হলে
- ক্রোমোজোমে অস্বাভাবিকতা থাকলে
- গর্ভকালীন সময়ে মায়ের এক্স-রে করালে

শিশুর কম ওজনের প্রভাব

- ফুসফুসের গঠন সঠিকমতো না হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা হয়ে থাকে
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়
- শরীরে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী থাকে, ফলে জন্ডিস দেখা দেয়

- শিশু অপুষ্টিতে ভোগে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে
- শিশু নানা ধরণের রোগ জীবাণু দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায়
- বিপাকজনিত (মেটাবলিক) সমস্যা হয়ে থাকে
- শরীরের তাপমাত্রা সঠিক ভাবে বজায় থাকে না
- জন্মগত বিকলঙ্গতা দেখা দিতে পারে
- জন্মগত ভাবে কিছু রোগ নিয়ে জন্ম হতে পারে যেমন- হৃদপিন্ডে ছিদ্র (Patent ductus arteiosus) থাকতে পারে
- পরবর্তী জীবনে বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন- ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপিন্ডের রোগ, স্থূলতা ইত্যাদি
- নবজাতকের মৃত্যু ঘটতে পারে

কম ওজনের নবজাতকের পরিচর্যা

হাসপাতালে কম ওজনের শিশুর যত্ন

জন্মের পর কম ওজনের নবজাতকের সুস্থতার জন্য প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

- কম ওজনের শিশুদের যথাযথ পুষ্টির জন্য নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ারের প্রয়োজন হয়, যেখানে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি দিয়ে স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়
- কম ওজনের নবজাতকের ফুসফুসের গঠন ঠিকমত না হবার ফলে জন্মের পর শিশুর শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। হাসপাতালে এ সময় ভেন্টিলেটরের সাহায্যে সাময়িক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। "সারফেকট্যান্ট" নামে এক ধরণের ঔষধ পাওয়া যায় যা এসব বাচ্চাদের অসম্পূর্ণ ফুসফুসকে কর্মক্ষম করে তুলতে পারে
- জন্মের পর বেশির ভাগ কম ওজনের শিশুর বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি থাকে। এই বিলিরুবিনের মাত্রাই জন্ডিসের নির্দেশক। শিশুদের জন্ডিস হলে ফটোথেরাপী অর্থাৎ আলোর নিচে রেখে চিকিৎসা করতে হবে
- শিশুকে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বা স্যালাইন লাগিয়ে অথবা নাকের ভিতর দিয়ে নলের সাহায্যে দুধ দেয়া হয়

বাসায় নিয়ে আসার পর যত্ন

হাসপাতালে বাচ্চা স্বাভাবিক হয়ে উঠলে ও অন্যান্য শিশুর মত মায়ের বুকের দুধ খেতে শিখলে, শিশুকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে আনার পর আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় শিশুকে রাখতে হবে। ঘরের তাপমাত্রা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কম ওজনের নবজাতক খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই এসব শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কম ওজনের বাচ্চাদের হাইপোথারমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। সেজন্য শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে হবে। সবসময় শিশুকে উষ্ণ পরিবেশে রাখতে হবে। পরিষ্কার হাতে শিশুকে ধরতে হবে। শিশুর পরিধানের কাপড় পরিষ্কার রাখতে হবে। শ্বাস নিতে কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরের লালা এবং নাকের সর্দি পরিষ্কার করে দিতে হবে। শিশুকে পরিষ্কার তোয়ালে হাল্কা গরম পানিতে ভিজিয়ে এবং পরবর্তীতে তোয়ালে থেকে পানি ঝরিয়ে শিশুর সারা শরীর মুছে দিতে হবে। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছার পর অবশ্যই শিশুর শরীর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার জামা কাপড় পরিয়ে দিতে হবে।

শিশুর পুষ্টি

কম ওজনের শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অবশ্যই প্রয়োজন। কম ওজনের শিশুর যথাযথ বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। সব ধরণের পুষ্টিগুন মায়ের দুধে বিদ্যমান। এছাড়াও মায়ের দুধের পাশাপাশি তার জন্য মাল্টি ভিটামিন ও মিনারেলের প্রয়োজন হতে পারে।

শিশুকে বহিরাগতদের থেকে দূরে রাখা

যেহেতু কম ওজনের বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাই বাচ্চাকে প্রতিবার স্পর্শ করার আগে **হেক্সিসল** দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব বাচ্চার ঘরে কম লোকজনের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। সিগারেটের ধোঁয়া নবজাতক শিশুর জন্য বিপদজনক। কম ওজনের নবজাতকের জন্য তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। শিশুর সামনে ধূমপান একদমই করা উচিত নয়।

কেএমসি পদ্ধতিতে যত্ন

কম ওজনের নবজাতকের পরিচর্যা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে ক্যাঙ্গারু মায়ের যত্ন যাকে সংক্ষেপে কেএমসি বলে। কম ওজনের নবজাতকের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও জটিলতা এড়াতে শিশুকে এ পদ্ধতির মাধ্যমে যত্ন নেয়া হয়। কেএমসি পদ্ধতির মূল অংশ হচ্ছে-

- মা ও বাচ্চার ত্বকে ত্বক স্পর্শ করানো
- শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো

সফল কেএমসির জন্য এ দুটো কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। তাহলে শিশুর ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশও দ্রুত ঘটবে। এ পদ্ধতিতে শিশু যেহেতু মায়ের বুকে সারাক্ষণ নিবিড়ভাবে থাকে, সেজন্য তার নবজাতকের শরীর সবসময় উষ্ণ থাকে।

কম ওজনের শিশুদের শারীরিক অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। মা বাবার আন্তরিক যত্ন এবং সার্বক্ষণিক পরিচর্যা এ ধরণের শিশুকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

গবেষণাগারে তৈরি কৃত্রিম ত্বক

সম্প্রতি জাপানের একদল বিজ্ঞানী গবেষণাগারে কৃত্রিম ত্বক তৈরি করেছে যাতে ঘর্মগ্রন্থিও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই কৃত্রিম ত্বক ইঁদুরের দেহে প্রতিস্থাপন করে দেখেছে যে, ইঁদুরের দেহে প্রতিস্থাপনের পর ইদুরের নতুন চুল গজিয়েছে এবং ভালভাবে খাপ খেয়েছে। এই তথ্যটি বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী সায়েন্স অ্যাডভান্সেস এ প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মানবদেহের উপযোগী ত্বক তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা সফল হতে আরো ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে। কৃত্রিম ত্বক তৈরী এই পদ্ধতিটি যাতে নিখুঁত ভাবে কাজ করে সেই জন্য বিজ্ঞানীরা আগুনে দগ্ধ ব্যক্তির কোষ ব্যবহার করবেন যা আগুনে পুড়া ব্যক্তির ক্ষত স্থানে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে কালচার ও কলম পদ্ধতি ব্যবহার করে যেই কৃত্রিম ত্বক তৈরি করা হয়, তাতে এমন কিছু জৈব উপাদান অনুপস্থিত থাকে, যার ফলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় না। গবেষণা প্রতিবেদনটির জ্যেষ্ঠ গবেষক তাকাশাই সুজি বলছেন, "এর আগ পর্যন্ত ত্বক তৈরির ক্ষেত্রে কয়েকটি অন্তরায় ছিল যার মধ্যে রয়েছে চুলের ঘর্মগ্রন্থির

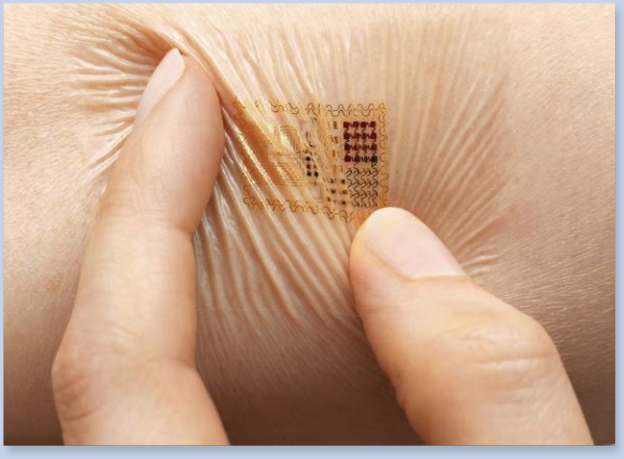

মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি, যেগুলো ত্বকের কর্মকান্ডের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে ত্বক তৈরি করেছি, তা স্বাভাবিক টিস্যুর কাজকে হুবহু নকল করে থাকে"।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

তৈলাক্ত মাছে বাতের ঝুঁকি কমে

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, যেসব মাছের রং সাদা ও তৈলাক্ত, সেসব মাছ সপ্তাহে দুই টুকরা করে খেলে বাতের মতো শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি অর্ধেক কমে যা বিজ্ঞানীরা ৩২ হাজার সুইডিশ নারীর ওপর গবেষণা করে এই ফলাফল পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার ফলাফল অ্যানালস অব রিউম্যাটিক ডিজিজেস সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, তৈলাক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়, যা মস্তিস্ক ও হৃদপিন্ড ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া তৈলাক্ত মাছে ভিটামিন ডি থাকে, যা বাতের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। যুক্তরাজ্যে বাত গবেষণা কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক অ্যালান সিলম্যান বলেন, "যাদের বাত রয়েছে, তারা যদি নিয়মিত সাদা ও তৈলাক্ত মাছ খায়, তাহলে বাতের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসে, এছাড়া বাতের ব্যথা দূর হয়"। যাঁরা সন্তানসম্ভবা বা যাঁরা

শিগগিরই সন্তান নিতে চান, তাঁদের সপ্তাহে দুই টুকরার বেশি তৈলাক্ত মাছ খাওয়া উচিত নয় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা, কারণ এতে ক্ষতি হতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ 'অস্টিওআর্থ্রাইটিস' থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ২৫ এপ্রিল ২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১ অস্টিওআর্থ্রাইটিসে প্রদাহ কোথায় হয়?

ক) অস্থিতে
খ) জয়েন্ট ক্যাপসুলে
গ) অস্থি সন্ধিতে
ঘ) সাইনুভিয়ামে

২ অস্টিওফাইট কি?

ক) গিটে নতুন হাড়
খ) গিটের নাম
গ) ক্যাপসুলের ভিতরের লাইনিং
ঘ) জয়েন্ট ক্যাপসুল

৩ অস্টিওআর্থ্রাইটিস সাধারণত কত বছর বয়সে হয়?

ক) ৩৫ থেকে ৪০ বছর
খ) ৪০ থেকে ৪৫ বছর
গ) ৪৫ থেকে ৫০ বছর
ঘ) ৫০ থেকে ৫৫ বছর

৪ নিচের কোনটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়?

ক) বয়স
খ) গ্রন্থির রোগ
গ) বয়ঃসন্ধি কাল
ঘ) ক ও খ উভয়ই

৫ কোনটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের লক্ষণ নয়?

ক) খুঁড়িয়ে হাঁটা
খ) দাঁড়াতে কষ্ট হয়
গ) গিট ফুলে যাওয়া
ঘ) জ্বর আসা

৬ নিচের কোনটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের পরীক্ষা নয়?

ক) সাইনুভিয়াল ফ্লুইড পরীক্ষা
খ) টিস্যু বায়োপ্সি
গ) এক্স-রে
ঘ) এম আর আই

৭ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড দিয়ে কি নির্ণয় করা হয়?

ক) গিটের প্রদাহ
খ) গিটের ব্যথা
গ) গিটের ইনফেকশন
ঘ) গিটের ক্ষয়

৮ নিচের কোনটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা নয়?

ক) ব্যথানাশক ঔষধ
খ) কনজারভেটিভ ব্যবস্থা
গ) হরমোন থেরাপী
ঘ) সার্জিক্যাল চিকিৎসা

৯ নিচের কোনটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সার্জিক্যাল চিকিৎসা?

ক) টোটাল মায়োমেক্টমি
খ) কোলেসিস্টেক্টমী
গ) টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট
ঘ) টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট

১০ নিচের কোন ইনজেকশনটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসে দেওয়া হয়?

ক) স্টেরয়েড ইনজেকশন
খ) এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন
গ) এন্টি ভাইরাল ইনজেকশন
ঘ) ম্যাগনেসিয়াম ইনজেকশন

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
সিম্পলট্রি আনারকলি, ৮৯, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২

ডিজাইন
ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ, রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

ADVANCING
POSSIBILITIES